The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 2 No.3 February, 2009 Page: 101-110, Published on December 2009 by the Registrar, Dhaka University ISSN-2075-3098

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননাম: ভাষাতাত্ত্বিক পটভূমি

গুলশান আরা বেগম [১]

১. সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Abstract:
Although place-names are strictly defined as geographical names but they may be derived from diverse linguistic roots and they form part of the cultural and linguistic history of the country. Hence, Bengali place-name has been an interesting area of Bengali Linguistics explored by different language researchers and linguists at different times. In this present study, `the place names of Brahmanbaria: linguistic perspectives' aims at achieving the diverse linguistic analysis of morphemic structures as well as phonetic changes in the regional or dialectal utterances of the collected place-names. The study also aims at creating new interest in the field of place-name analysis to the new researchers as well.

Key words: *Place-Name, Compund word, affixes*

১. ভূমিকা

বাংলা স্থাননামের আলোচনা বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের একটি কৌতুহলোদ্দীপক এলাকা। বিভিন্ন সময়ে ভাষা-গবেষক ও ভাষাবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। 'বাংলা স্থাননাম' শীর্ষক একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন ভাষাবিজ্ঞানী সুকুমার সেন (সুকুমার, ১৯৮২)। তিনি বর্ধমান-হুগলী-বীরভূম-বাঁকুড়া-মেদেনীপুর-কোলকাতা ও তৎকালীন পূর্ব বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থাননাম সংগ্রহ করেন এবং এগুলোর ভাষিক বিশ্লেষণ, ব্যুৎপত্তি ও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ আলোচনা করেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলাভাষার নমুনা হিসেবে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপি থেকে ব্যুৎপত্তি সহকারে বাংলা স্থাননামের একটি তালিকা উপস্থাপন করেছেন

(Chatterji, [১৯২৬] ১৯৯৩)। এছাড়া বাংলাদেশের স্থাননাম নিয়ে সুকুমার সেন অনুসরণে আলোচনা করেছেন মহাম্মদ দানীউল হক (দানীউল, ১৯৮৫)। বিভিন্ন উপভাষার ভাষিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী মনিরুজ্জামান বিভিন্ন ঔপভাষিক এলাকার স্থাননামের আঞ্চলিক উচ্চারণ-রীতির বৈশিষ্ট্যও প্রদর্শন করেছেন (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪)। এছাড়া বিভিন্ন জেলার ইতিহাস ও গেজেটিয়ার গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন স্থাননামের নামকরণ ও ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়।

বর্তমান নিবন্ধে বাংলাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন স্থাননামের ভাষিক আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। এ অঞ্চলের স্থাননামে বিপুল বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় যা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যসমৃদ্ধ বিধায় তা যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে।

৭৪৪ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে ৮টি থানা, ৯৭টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভা, ৪টি ওয়ার্ড, ২৮টি মহল্লা ও ১৩৫০টি গ্রাম নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা। এ জেলার লোকসংখ্যা ২ কোটি, ১৪ লক্ষ, ১ হাজার ৭ শত ৪৫ জন (Bangladesh population Census, 1991)। এ জেলার বিভিন্ন স্থাননামে ছড়িয়ে আছে বিপুল ভাষিক বৈচিত্র্য। ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেহেতু পূর্বে কুমিল্লা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল সেহেতু এ জেলার বিভিন্ন স্থাননামের নামকরণের ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে 'কুমিল্লা জেলার ইতিহাস' (মোবাশ্বের [সম্পা.], ১৯৮৪), 'বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার: কুমিল্লা' (হাবীবুর [সম্পা.], ১৯৮১) ও 'জেলা পরিক্রমা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া' (আক্তারুজ্জামান [সম্পা.], ১৯৯১) শীর্ষক তিনটি গ্রন্থে।

বাংলাভাষার স্বরূপ বুঝতে হলে যেমন এর বিভিন্ন উপভাষার বিশ্লেষণ প্রয়োজন, তেমনি বাংলা স্থাননামের স্বরূপ বুঝতে হলেও বিভিন্ন অঞ্চলের স্থাননামের ভাষিক গঠন, ব্যুৎপত্তি ও অর্থ জানতে হয়। তাছাড়া স্থাননাম আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য, সমাজ-সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে। অর্থাৎ স্থাননামে আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির উপকরণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম হলো 'কুড়িঘর'। এ স্থাননামের প্রথম অংশ একটি সংখ্যা শব্দ। এটি প্রাক্ আর্য যুগের অস্ট্রিক সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ একটি অনার্য শব্দ হিসেবে বাংলা স্থাননামে যুক্ত হয়েছে। এখনো ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ অন্যান্য অঞ্চলেও গণনা পদ্ধতি হিসেবে 'এক কুড়ি', 'দুই কুড়ি' বহুল প্রচলিত।

বাংলা স্থাননামের বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে সুকুমার সেন লিখেছেন, 'বাংলা স্থাননামে যেমন বৈচিত্র্য আছে এমন আর কোন ভাষার এলাকায় দেখা যায় না, সে ভাষা আমাদের দেশেরই হোক বা বিদেশেরই হোক' (সুকুমার, ১৯৮২)। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননামেও বিপুল বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

স্থাননাম এক প্রকার চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া এবং নাম বলেই তা বিশেষ্য পদ (দানীউল, ১৯৮৫:৩৩)। কিন্তু স্থাননাম কেবলই একটি নাম নয়। এর কোন না কোন অর্থ বা নিহিতার্থ রয়েছে যা অনুসন্ধিৎসু গবেষককে আকৃষ্ট করে। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে-

> স্থাননাম কখনো নিরর্থক হয় না। আমরা এখন তার মানে না বুঝতে পারি, কিন্তু একদা সে স্থাননামের একটা অর্থ ছিলই। আদর করে ছেলের নাম রাখা যায় যা-তা কিন্তু বাসস্থানের নাম কেউ আদর করে যা-তা রাখে না। একটা মানে ধরে বা কল্পনা করে স্থানের নাম রাখা হয় (সুকুমার, ১৯৮২:১)।

ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থাননামকে দেখা হয় একগুচ্ছ ধ্বনিসমষ্টি হিসেবে যার কোন না কোন অর্থ বা অর্থের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আবার স্থাননাম এক বা একাধিক রূপমূল বা শব্দ নিয়ে গঠিত হয়। কাজেই স্থাননামের ভাষিক গঠনগত বিশ্লেষণ স্থান পাবে রূপমূলতত্ত্বের আলোচনায়। এছাড়া, স্থাননামের মান্যরূপের পাশাপাশি স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ রীতির কারণে আঞ্চলিক রূপও পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে স্থাননামের মান্যরূপের আঞ্চলিক উচ্চারণে যে ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক উল্লেখ করা যেতে পারে।

২. সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননাম বিশ্লেষণ

সুকুমার সেন বাংলা স্থাননামের গঠনগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে গিয়ে লিখেছেন-

> গঠন লক্ষ্য করলে বাংলা স্থাননামকে দু'ভাগে ফেলা যায়: একক, অর্থাৎ একটি শব্দময়, আর অন্যটি দ্বিক, অর্থাৎ দু'টি শব্দময়। দুটির বেশি শব্দ নিয়ে গড়া নামও আছে কিন্তু সে নামগুলি দ্বিক নামেরই বর্ধিত রূপ, সমনামের বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য (সুকুমার, ১৯৮২:৮)।

সুকুমার সেন মূলত: প্রথাগত ব্যাকরণের শব্দবিদ্যার আলোকে বাংলা স্থাননামের গঠন আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে শব্দের চেয়ে ক্ষুদ্র অর্থযুক্ত ভাষিক একক হিসেবে রূপমূলের (morpheme) অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননামের গঠনগত বিশ্লেষণে রূপমূলগত বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। রূপমূল গঠনগত বিচারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননামগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা, ১) এক রূপমূল বিশিষ্ট ও ২) একাধিক রূপমূল বিশিষ্ট। শেষোক্ত শ্রেণীর স্থাননামে একটি প্রধান রূপমূলের (stem) সাথে আদ্য-প্রত্যয় (prefix) ও অন্ত্য-প্রত্যয় (suffix) যুক্ত থাকতে পারে। সেদিক থেকে এ শ্রেণীর স্থাননামকে আবার আরও দু'টো ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, ক) আদ্য-প্রত্যয়যুক্ত খ) অন্ত্য-প্রত্যয়যুক্ত (দানীউল, ১৯৮৫:৩৫)।

২.১ এক রূপমূলযুক্ত স্থাননাম

এক রূপমূলযুক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননাম খুব বেশি একটা নেই। এ শ্রেণীর স্থাননামের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, 'কুটি' (<কুঠি বা ঘর), 'পাল্লা' (<পারুল গাছবহুল এলাকা), 'কসবা' (<ফার্সী 'কাসাভা' অর্থাৎ ছোট্ট সুন্দর শহর), 'পত্তন' (বসতি স্থাপন), 'চান্দুরা' (<চন্দ্র বা চাঁদের ন্যায় দীপ্তিময় স্থান) ইত্যাদি। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে, এক-শব্দাত্মক স্থাননামের শেষে স্বরধ্বনি যুক্ত থাকে। যেমন, -'ই', -'এ', -'আ', -'ও' অথবা 'উ'। এগুলি শব্দান্তিক স্বার্থিক -'ক' ('কা'), অথবা 'ইক' ('ইকা'), কিংবা 'উক' ('উকা') প্রত্যয়ের পরিণাম (সুকুমার, ১৯৮২:৯)। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননামে বিশেষকরে 'কসবা', 'পাল্লা', নামে শব্দান্তিক -'আ', 'কুটি' নামে শব্দান্তিক -'ই' স্বরধ্বনি এবং 'ফান্দুক' ও 'রাধিকা' নামে যথাক্রমে শব্দান্তিক স্বার্থিক 'উক' ও 'ইকা' যুক্ত হয়েছে। তবে 'ফান্দুক' (<ফাঁদ + উক), ও 'রাধিকা' (<রাধা + ইকা) স্থাননাম দুটি এক শব্দাত্মক হলেও রূপমূলগত বিচারে স্পষ্টতই একটি মুক্ত রূপমূল ও একটি বদ্ধ রূপমূলের সাহায্যে গঠিত হয়েছে বিধায় এক রূপমূল বিশিষ্ট স্থাননামের শ্রেণীতে পড়ে না।

এক রূপমূলযুক্ত স্থাননামের রূপমূলগত অর্থ বা শাব্দিক ব্যুৎপত্তি বের করা যেতে পারে ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে। কিন্তু কালের বিবর্তনের সাথে সাথে ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে অনেক স্থাননাম মূলানুগ শব্দার্থ দ্বারা শর্তায়িত (conditioned) আর নেই। ফলে, বাচ্যার্থে এই নামগুলো অর্থহীন -তাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় পণ্ডশ্রমই শুধু মনে হবে না উৎসাহী পাঠক/গবেষকের কাছে তা আপাতত: বিভ্রান্তিকরও মনে হবে (দানীউল, ১৯৮৫:৩৫)। অনেক স্থাননামের পেছনে আছে ইতিহাস। যেমন, 'আখাউড়া' নামের পেছনে ইতিহাস রয়েছে। সুদূর অতীতে ত্রিপুরার রাজা রাধাকৃষ্ণ মানিক্য বর্তমান 'আখাউড়া' নামক স্থানে একটি 'আখড়া' বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালের বিবর্তনে ধ্বনিগত পরিবর্তন বা ধ্বনিগত বিকৃতির (ponetic corruption) ফলে 'আখড়া' থেকে 'আখাউড়া' নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। অবশ্য 'আখড়া' রূপমূলটির গ্রাম্য উচ্চারণে ধ্বনিতাত্ত্বিক বিপ্রকর্ষ (vowel insertion) রীতি প্রযুক্ত হতে পারে। এ রীতি অনুসারে রূপমূলের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি ভেঙ্গে গিয়ে এতে স্বরধ্বনির আগম হয়। ফলে 'আখড়া' রূপমূলটি 'আখাউড়া' হিসেবে উচ্চারিত হয়। 'আখাউড়া' স্থাননামটির একাধিক রূপমূল বিশিষ্ট অপর একটি সংগঠন লক্ষণীয়। 'খাউড়া' (আংশিক ভক্ষিত) রূপমূলের সঙ্গে 'আ'- আদ্য-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'আখাউড়া' নামটি গঠিত হতে পারে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলাধীন 'নাখাউড়া' এবং নবীনগর উপজেলাধীন 'লীখাউড়া' স্থাননামের গঠন পর্যালোচনায় 'খাউড়া' রূপমূলের সঙ্গে না-বাচক আদ্য-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্থাননাম গঠিত হয়েছে বলে মনে করা যায়।

২.২ একাধিক রূপমূল বিশিষ্ট স্থাননাম

একাধিক রূপমূল বিশিষ্ট স্থাননামগুলো সাধারণত সমাসবদ্ধ বা যৌগিক শব্দ (compound word)। এ শ্রেণীর স্থাননামের বেশির ভাগই দু'টি রূপমূল নিয়ে গঠিত। তবে দু'য়ের অধিক রূপমূলযুক্ত স্থাননামও বহু পাওয়া যায়। যেমন, 'বাঞ্ছারামপুর', 'সীতারামপুর' ইত্যাদি। এখানে 'বাঞ্ছারাম' ও 'সীতারাম' দু'টো করে রূপমূল নিয়ে গঠিত হলেও এরা ব্যক্তিনাম হিসেবে একক শব্দ হিসেবে কাজ করছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননামে কখনো কখনো বিশেষত্ববাচক রূপমূলের উপস্থিতিও পরিলক্ষিত হয় (সুকুমার, ১৯৮২:৩২)। যেমন, 'চর-ইসলামপুর'। এখানে একাধিক 'ইসলামপুরের' মধ্যে একটিকে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। একাধিক রূপমূল বিশিষ্ট স্থাননামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়েও এতিহাসিক সূত্র সন্ধানের প্রয়োজন পড়ে। কেননা, কালের বিবর্তনে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে এ সকল নামের কোন কোনটিকে একক মনে হয়। অবিমিশ্র ধ্বনিসঙ্গতি এই বিভ্রান্তিকে কখনো কখনো আরও বাড়িয়ে তোলে। এমন প্রাচীন নামে প্রাচীন দ্বিতীয় অংশটি লুপ্ত হয়ে প্রত্যয়ে পরিণত হয় (সুকুমার, ১৯৮২:১৪)। যেমন, 'মৌড়াইল'(<মৌড় + আইল), 'দেওড়া' (দেওর বা দেবর +পাড়া)। স্থাননাম দু'টোতে 'আইল' ও 'পাড়া' রূপমূল দু'টি যথাক্রমে -'ইল' ও -'ড়া' প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। তবে, যে সকল স্থাননাম আদ্য-প্রত্যয়যুক্ত সেগুলো ধ্বনিগত পরিবর্তনে অপেক্ষাকৃত কম বিবর্তিত হয়, ফলে রূপমূল হিসেবে এগুলো নিয়ে সমস্যাও কম (দানীউল, ১৯৮৫:৩৬)। একাধিক রূপমূলযুক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননামগুলো আদ্য-প্রত্যয়যুক্ত ও অন্ত্য-প্রত্যয়যুক্ত হিসেবে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে:

২.৩ আদ্য-প্রত্যয়যুক্ত স্থাননাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একাধিক রূপমূলযুক্ত যে সকল স্থাননাম আদ্য-প্রত্যয় যোগে গঠিত হয় তার মধ্যে কতকগুলো নিম্নরূপ:

'বিনা'-	: 'বিনাটি' (<বিনা + হট্টিক) অর্থাৎ যেখানে কোন হাট নেই;
'সু'-	: 'সুহাতা' [<সু (ভাল) + হাতা (পাত্র বা স্থান) অর্থাৎ ভাল বাসস্থান;
'বিট'- (উপবিষ্ট)	: 'বিটঘর' (উপবেশন স্থান);
'নাট'-	: 'নাটঘর' (<নাট্যঘর) অর্থাৎ যেখানে নাচ-গান হয়;
'বা'-	: 'বায়েক' (বা +এক); ইত্যাদি।

২.৪ অন্ত্য-প্রত্যয়যুক্ত স্থাননাম

অন্ত্য-প্রত্যয় যোগে গঠিত একাধিক রূপমূল বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননামের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন রূপমূল যেমন আদ্য-প্রত্যয় হিসেবে

প্রধান রূপমূলের আদিতে বসে স্থাননাম গঠন করে তেমনি আবার অন্ত্য-প্রত্যয় হিসেবেও রূপমূলের অন্তে বা শেষে যুক্ত হয়ে স্থাননাম গঠনে ভূমিকা রাখে। যেমন, -'কান্দি' : 'শিমরাইলকান্দি', 'মরিচাকান্দি', 'ভাতুয়াকান্দি', 'পাহাড়িয়াকান্দি', 'সাইফুল্লাকান্দি' ও 'রাজামারাকান্দি' ইত্যাদি। আরও যেসব অন্ত্য-প্রত্যয়যুক্ত স্থাননাম পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হচ্ছে:

-'আই' (তৃপ্তি <আশা) : 'নাটাই' (নাচে-গানে তৃপ্তিময় স্থান);

-'আইল' (জমি বা ভূমির সীমারেখা, বেড়িবাঁধ) : 'সরাইল' [সর (স্রোত বা প্রবাহ)+আইল], জলাশয় ভরাট হয়ে সৃষ্ট স্থলভাগ];

-'কুট' / -'কোট' (গৃহ, দুর্গ) : 'বিদ্যাকুট'/ 'বিদ্যাকোট' (বিদ্যা শিক্ষার স্থান);

-'জুড়ি' (ক্ষুদ্র উপনদী) : 'ঝালিজুড়ি', 'টোজুড়ি'[টো (টোকা) +জুড়ি], ক্ষুদ্র উপনদী বেষ্টিত স্থান];

-'তলা' (<সংস্কৃত 'স্থলক 'বা 'তলক') : 'পৈরতলা' [পৈর(<ফৈর বা ফকির) + তলা], [ফকির/দরবেশের আশ্রয়স্থল], 'কাইতলা' [কাই (এক প্রকার পাট) + তলা], [পাট উৎপন্ন হয় এমন স্থান];

-'পট্টি' (ক্ষুদ্র বাজারা) : 'মহাদেবপট্টি', 'ঘোড়াপট্টি', ছাতিপট্টি';

-'বাদ' (<ফার্সী 'আবাদ' মানে জনপদ) : 'নিদারাবাদ' [<'নাসিরাবাদ' এর অপভ্রংশ, জনশ্রুতি এই যে, মোঘল শাসনামলে দেওয়ান নাসির মোহাম্মদকে প্রদত্ত জায়গির তাঁর নামানুসারে প্রথমে 'নাসিরাবাদ' নাম পরবর্তীকালে উক্ত স্থানে জায়গিরভুক্ত অপরাধীদের নির্দয়ভাবে হত্যা করা হতো বিধায় তা 'নিদারাবাদ' (নির্দয়স্থান) হিসেবে অভিহিত হতে থাকে];

-'পুর' (সংস্কৃত 'পুর' মানে স্থান। এ স্থান নামাংশটি অষ্টম-নবম শতাব্দির আগে তেমন প্রচলিত ছিল না। ষোড়শ শতাব্দির আগে থেকেই 'পুর' শব্দের প্রচলন বাড়তে থাকে। সাধারণত ব্যক্তিনামে অথবা পদবীতে 'পুর' শব্দ বেশি পাওয়া যায় (সুকুমার, ১৯৮২:২৭)। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননামে এই 'পুর' অন্ত্য-প্রত্যয়যুক্ত স্থাননামই সবচে' বেশি পাওয়া যায়।): 'আবদুল্লাহপুর', 'আমিনপুর', 'ইছাপুর', 'ইব্রাহীমপুর', 'ইসলামপুর', 'একতারপুর', 'কাঞ্চনপুর', 'গোপালপুর', 'গোপীনাথপুর', 'চান্দপুর', 'জুনেদপুর', 'দরিয়াপুর', 'দুলালপুর', 'নারায়ণপুর', 'পাহাড়পুর', 'বাঞ্ছারামপুর', 'বিষ্ণুপুর', 'মজলিশপুর', 'মুকুন্দপুর', 'রতনপুর', 'রাজাপুর', 'লাউর ফতেহপুর', 'শাহপুর', 'শাহবাজপুর', 'শেরপুর', 'শিকারপুর', 'শিবপুর', 'শিবরামপুর', 'শ্রীরামপুর', 'সাদেকপুর', 'সুলতানপুর', 'সুহিলপুর', 'সোনারামপুর', 'সোহাগপুর', 'হরষপুর', 'হরিপুর' ইত্যাদি;

-'বাড়ি' : 'ইমামবাড়ি';
-'বাড়িয়া' (<সংস্কৃত 'বাটিকা' মানে বেড়া দেওয়া অথবা প্রাচীর ঘেরা স্থান) : 'দেওবাড়িয়া', 'ফুলবাড়িয়া', 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া' ইত্যাদি। 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া' স্থাননামের রূপমূলগত গঠন ও অর্থ নির্ণয়ে ঐতিহাসিক সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে একাধিক জনশ্রুতি পাওয়া যায়। একটি জনশ্রুতি অনুসারে সেন বংশের রাজত্বকালে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব-প্রসার প্রতিরোধকল্পে রাজা লক্ষণ সেন ভারতের উত্তর প্রদেশের কান্যকুব্জ (আধুনিক কনোজ) থেকে পাঁচটি কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবার এনেছিলেন। উল্লিখিত পরিবারগুলোর একত্রিত বাসস্থল 'ব্রাহ্মণবাড়ি' থেকে 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া' নামের উৎপত্তি হয়েছে। সম্রাট আকবরের সময়কার (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ) অপর একটি জনশ্রুতি এই যে, সেই সময়ে তিতাস পাড়ের একটি সীমিত অঞ্চলে ব্রাহ্মণরা নব্য মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করছে এমন সংবাদে তৎকালে সিলেটস্থ মুসলিম শাসনকর্তার নির্দেশে দুজন অসম যোদ্ধা, শাহবাজ আলী নৌ-পথে তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন সরাইলের তিন মাইল পূর্ব দিকে একটি স্থানে (যা পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে নামকরণ করা হয় 'শাহবাজপুর') এবং ইসলাম খাঁ স্থলপথে অশ্বারোহণে তাঁর দলবল নিয়ে অবস্থান নেন চান্দুরার দুই মাইল উত্তরের একটি স্থানে (যা পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে নামকরণ করা হয় 'ইসলামপুর' হিসেবে)। তাঁরা দুজন তাঁদের দলবল নিয়ে স্থল ও নৌ- উভয় পথে তড়িঘড়ি ব্রাহ্মণদের বেড় দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে কোণঠাসা করে ফেলেন ও তাঁদেরকে মেরে উদ্ধার করেন বিপন্ন মুসলমানদের। ব্রাহ্মণদের বেড় দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে মেরে ফেলা থেকে 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া' নামের উৎপত্তি হয়েছে।
যৌগিক শব্দ দ্বারা গঠিত 'ব্রাহ্মণবাড়িয়ার' স্থানামগুলোকে আবার নিম্নরূপ দুটি ভাগে দেখানো যেতে পারে। যেমন,

(ক) শব্দের আদ্য অবস্থানে রূপমূল যুক্ত হয়ে গঠিত স্থাননাম;
(খ) শব্দের অন্ত্য অবস্থানে রূপমূল যুক্ত হয়ে গঠিত স্থাননাম;

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একাধিক রূপমূলযুক্ত যৌগিক স্থাননামে যেসব আদ্য রূপমূল যুক্ত হয় তার মধ্যে সংখ্যাবাচক রূপমূল অন্যতম। যেমন,

'দুলা'- : 'দুলাবাড়ি' (দুই বাড়ির সংযোগ); ইত্যাদি।
'আড়াই'- : 'আড়াইসিদা' [আড়াই + সিদা (অপক্ব আহার্য সামগ্রী)];
'চার'- : 'চারতলা', 'চারগাছ;

'ছয়'- : 'ছয়বাড়িয়া', ছয়ঘরিয়া';
'সাত'- :'সাতমুড়া', 'সাতগাঁও';
'অষ্ট'- : 'অষ্টগ্রাম';
'নোয়া'- ('নয়' এর সহরূপ) : 'নোয়াগাঁও';
'দশ'- : 'দশদোন' [দশ + দ্রোণ (১৬ কেদায় এক দ্রোণ জাযগা];
'কুড়ি'- : 'কুড়িঘর';
'বিয়াল্লিশ'- : 'বিয়াল্লিশ্বর'।

এছাড়া আরও যে সকল আদ্য রূপমূলযুক্ত যৌগিক স্থাননাম পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:
কালিকচ্ছ (জলময় স্থান, কালিসীমা (কালি...অঞ্চল)
'কান্দি'- (নদী বা খালের পার্শ্বের উঁচু জমি) : 'কান্দিপাড়া';
'খৈয়া'- (<খেয়া বা নৌকা) : 'খৈয়াঘাট' (নৌকাঘাট);
'দরিয়া'- : 'দরিয়াদৌলত', 'দরিয়াপুর';
'চর'- : 'চর-ইসলামপুর', চর-চারতলা;
'জাল'- : 'জালশুকা';
'মধ্য'- : 'মধ্যপাড়া' (শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত গ্রাম)
'পূর্ব'- : 'পূর্ববাগ'

যৌগিক স্থাননাম গঠনে অন্ত্য-রূপমূল হিসেবে যে সকল রূপমূল যুক্ত হয় তার কয়েকটি নিম্নরূপ:

-'ঈশ্বর' (ভগবান) : 'পানিশ্বর' (পানি + ঈশ্বর), 'বুড়িশ্বর' (বুড়ি +ঈশ্বর);
-'খলা' (< আরবি 'খলা' মানে মাঠ) : 'বড়িখলা' [বড়ি (<বটিকা) + খলা];
-'খাল' (<সংস্কৃত 'খল্ল' মানে নিম্নভূমি) : 'তেজখাল' [তেজ +খাল], [খরস্রোতা খাল বয়ে গেছে এমন নিম্নভূমি স্থান];
-'গঞ্জ' (< ফার্সী 'গঞ্জ' মানে বাণিজ্যস্থান) : 'আশুগঞ্জ', 'ছলিমগঞ্জ' (বাণিজ্যস্থান);
-'গড়' (পরিখা বা গর্ত) : 'কৈলারগড়' [১৬ শ শতাব্দিতে হোসেন শাহ কর্তৃক আগরতলা আক্রমণের সময় পরিখা নির্মিত হয়েছিল যে স্থানে তা আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে 'কৈলারগড়' হিসেবে];
-'গাঁও' (গ্রাম) : 'বীরগাঁও', 'শালগাঁও';
-'গ্রাম' (<গাঁ) : 'যথাগ্রাম', 'মূলগ্রাম' ও 'শ্যামগ্রাম' 'দেবগ্রাম' [বৌদ্ধদের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান];
-'ঘর' (বাসস্থান অর্থে) : 'ভাদুঘর' (ভদ্র সমাজের বাসস্থান), 'রাজঘর' (রাজ কর্মচারীদের বাসস্থান);
-'ঘাট' (উঁচু থেকে অবতরণ স্থান) : 'নাওঘাট' (নৌকা ঘাট);
-'চর' (নদী গর্ভে পলি পড়ে সৃষ্ট স্থলভাগ) : 'উজানচর' (নদীর উজানভাগে সৃষ্ট স্থলভাগ);
-'দীঘি' (চতুষ্কোণ দীর্ঘখাত পুষ্করিণী) : 'সাগরদীঘি';
-'নগর' {প্রাচীনকালে 'নগর' বলতে পাথরের বা ইঁটের তৈরী গৃহ সংবলিত ধনী অথবা রাজা বা দেবতা অধিষ্ঠিত প্রাচীর ঘেরা গ্রামকে বোঝাত। পরে এই অর্থ ক্ষয় পেয়ে ইঁটে

গাঁথা শিবালয় অথবা দেবালয় বিশিষ্ট গ্রামকেই বোঝাতে থাকে। এদেশে বাংলা স্থাননামে 'নগর' শব্দের প্রচলন ঘটে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দি থেকে (সুকুমার, ১৯৮২:২৬)।}: 'আলীনগর', 'কৃষ্ণনগর', 'গোয়ালনগর', 'নবীনগর', 'নাসিরনগর', 'রাধানগর', 'চম্পকনগর', 'বাখরনগর' ও 'ভেলানগর' ইত্যাদি;

-'পাড়া' (<সংস্কৃত 'পাটক' মানে ঘন সন্নিবিষ্টি ভদ্রাসন সমষ্টি) : 'কাজী পাড়া', 'মধ্য পাড়া', 'পাইক পাড়া', নোয়াপাড়া;

-'বিল' (স্রোতহীন জলময় নিম্নভূমি) : 'কাজল বিল', 'পুনা বিল' [স্বচ্ছ জলময় নিম্নভূমি], সিঙ্গার বিল' [কণ্টকময় উদ্ভিদ জন্মে এমন স্থান];

-'বাজার' : 'আনন্দ বাজার', 'জগৎবাজার';

-'মুড়া' (<সংস্কৃত 'মুণ্ড' মানে মাথা বা প্রধান) : 'কামালমুড়া', 'বক্তারমুড়া', 'সাতমুড়া', 'সেজামুড়া';

-'শহর' (ফার্সী 'শহর' মানে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নগর) : 'তাল শহর';

-'শিমুল' (সংস্কৃত 'শিম্বল' বৃক্ষ) : 'কালি শিমুল', 'তুলাই শিমুল', 'পাক শিমুল' [শিমুল গাছ শোভিত স্থান];

-'হাতা (< হাত + আ) : 'মাছিহাতা', 'সুহাতা' ইত্যাদি।

৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননামের আঞ্চলিক উচ্চারণ রীতি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থাননামের উচ্চারণে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা কিছু ক্ষেত্রে মান্যরূপের উচ্চারণ করলেও অনেক সময় নিজস্ব কথ্যরীতি তথা আঞ্চলিক বা ঔপভাষিক উচ্চারণ রীতি পরিলক্ষিতি হয়। যেমন, 'সরাইল' নামটি মান্যরূপ অনুযায়ী প্রায় অবিকৃতভাবেই উচ্চারিত হয়। কিন্তু 'সুহাতা' স্থাননামটি 'হুয়াতা' হিসেবে উচ্চারিত হয়। রূপমূলের মধ্যে ধ্বনিগত পরিবর্তন ব্যাখ্যা করার জন্য কিংবা সূত্রাবদ্ধ করার জন্য পূর্ণাঙ্গ ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বর্তমান নিবন্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কতিপয় স্থাননামের আঞ্চলিক উচ্চারণ ও মান্যরূপের সাথে এর ধ্বনিগত পার্থক্য বা ধ্বনিগত পরিবর্তনের কয়েকটি দিক নিম্নে দেখানো হল:

স্থাননামের মান্যরূপ	আঞ্চলিক উচ্চারণ	ধ্বনিগত পরিবর্তন
'আখাউড়া'	'আহাউরা'	'খ' → 'হ' (জিহ্বামূলীয় ধ্বনি→ কণ্ঠনালীয় ধ্বনি)
'খাড়েরা'	'হারেরা'	'খ' → 'হ' ঐ
'কুটি'	'কুডি'	'ট' → 'ড' (অঘোষ ধ্বনি → ঘোষ ধ্বনি)
'নাটাই'	'নাডাই'	'ট' → 'ড' ঐ
'কালিকচ্ছ'	'কালিগচ্চ'	'ক' → 'গ' (অঘোষ ধ্বনি → ঘোষ ধ্বনি)
		'ছ' → 'চ' (ঘোষ, মহাপ্রাণ ধ্বনি → অঘোষ, অল্পপ্রাণ ধ্বনি)
		'ভ' → 'ব' (ঘোষ ধ্বনি → অঘোষ ধ্বনি)
'ভাদুঘর'	'বাদুঘর'	'স' → 'হ' (তালব্য দন্তমূলীয় ধ্বনি)
'সুহাতা'	'হুয়াতা'	'হ' → 'অ' (মহাপ্রাণ ধ্বনি→ অল্পপ্রাণ ধ্বনি)
'হরষপুর'	'অরশপুর'	

উপসংহার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন স্থাননামের ব্যুৎপত্তিগত ও ভাষাতাত্ত্বিক অন্যান্য বিশ্লেষণ উপভাষা বিশ্লেষণের মতোই আমাদের ভাষিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। তাছাড়া আঞ্চলিক স্থাননামের ভাষিক বিশ্লেষণ থেকে আমরা সংশ্লিষ্ট স্থাননামের বিশুদ্ধ পদানুমূল ও উচ্চারণে উপনীত হতে পারি। স্থাননামের ভাষিক গঠনে বিভিন্ন ভাষা (যেমন, আরবি, ফার্সী ও সংস্কৃত ইত্যাদি) ও সাংস্কৃতিক নৃ-গোষ্ঠীর বা দলের সূত্র থেকে নেয়া শব্দাবলীর মিশ্রণও লক্ষ্য করা যায়। এ সকল বিচারে স্থাননাম বিষয়ক ভাষিক গবেষণার গুরুত্ব অবশ্যই অনস্বীকার্য।

গ্রন্থপঞ্জি

মহাম্মদ দানীউল হক. ১৯৮৫. *বাংলাদেশের স্থাননাম: ভাষিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, ভাষাপত্র* (৩য় সংখ্যা)।

মনিরুজ্জামান. ১৯৯৪. *উপভাষা চর্চার ভূমিকা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মুহাম্মদ হাবীবুর রশিদ (সম্পাদিত). ১৯৮১. *বাংলাদেশের জেলা গেজেটিয়ার, কুমিল্লা* : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা।

মোবাশ্বের আলী (সম্পাদিত).১৯৮৪. *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস* . কুমিল্লা : জেলা পরিষদ.

মোঃ আক্তারুজ্জামান (সম্পাদিত). ১৯৯১. *জেলা পরিক্রমা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া* . জেলা তথ্য অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সুকুমার সেন. ১৯৮২. *বাংলা স্থাননাম*, কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

Bangladesh Population Census, 1991, Zila: Brahmanbaria: B.B.S. 1995.

Sunitikumar Chatterji.[1926]1993.*The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)*, Calcutta: Rupa & Co.

Email Contact: gulshan07@dhaka.net